একটি ছায়াযুদ্ধ - শিশুশ্রম বনাম আমরা

ব্রতীন রায়

" I was then of tender age, and slight,
Like my wingless bird, my frame was ever so light.
.....
When the school day was over, homewards I go
And over our roof top, I'd see the clouds hanging low"—

শৈশবের বাস্তবিক চিত্র বোধহয় এমনটাই হওয়া উচিত যেমন ছিল কবির কল্পনায়। একথা প্রায় নির্দ্বিধায় সকলেই স্বীকার করবেন যে শৈশব হল জীবনের বাকি সব পর্যায়ের থেকে উৎকৃষ্ট-বাচনে, চলনে, মননে ও অনুশীলনে। দুঃখের হলেও সত্যি আমাদের এই ১১৮ কোটির দেশে অনেক শিশুরই ওপরে কথিত চারটি প্রবণতা বা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দয়, অনৈতিক শ্রম দ্বারা। দেশের সার্বভৌমত্ব লাভের প্রায় ৬৩ বছর পরেও আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত, ভদ্র ও উন্নয়নশীল সমাজের গায়ে অভিশাপের কালশিটে হয়ে লেগে আছে শিশুশ্রম নামক এই নারকীয় ব্যভিচার।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ বা তারও পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জন্মলগ্ন থেকেই ভারতবর্ষে আধা সামন্ততান্ত্রিক, ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছে। দেশের সমাজ ও অর্থনীতি বিবর্তিত হয়ছে মুনাফাভোগী, ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের কথা ভেবে। সমস্ত উৎপাদনের উপায় বা শক্তি যেহেতু ধনীদের হাতে কুক্ষিগত, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী উৎপাদনের সম্বন্ধে হিসেবেই রয়ে যায়। উৎপন্ন সম্পদের ওপর তাদের কোনো অধিকার জন্মায় না। এই ব্যবস্থাজাত রাজনীতি স্বভাবতই সমাজের প্রতিপত্তিশালী, অর্থবান শ্রেণীর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। যে সব আইন সর্বসাধারণের অধিকার সুরক্ষার জন্য তৈরি হয় তার সুফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনীরাই ভোগ করে। সমাজের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত মানুষকে তার স্বীকৃত অধিকার দিতে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যর্থ হয় কারণ তাকে কাজ করতে হয় ভোগবাদী, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য যেখানে ধনী আরো ধনী, গরিব আরো গরিব হয়। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শোষণ এই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিলো যার থেকে সার্বভৌমত্ব লাভের এতগুলো বছর পরও স্বাবলম্বী হওয়া যায়নি দেশচালনায় ভ্রান্ত নীতির জন্য। স্বাধীনতার পর থেকেই নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকার যে কাজ প্রায় ধারাবাহিকভাবে করে এসেছে তা হলো দেশের মানব সম্পদের একটা ব্যাপক অংশকে অশিক্ষিত করে রাখা। (যদিও সংবিধানে শিক্ষা আছে যুগ্মতালিকা অর্থাৎ Conquerent list-এ, তাই রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে তাদের দায় এড়াতে পারে না।) যাতে করে এদেরকে শাসন ও শোষণ করতে সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ''হীরক রাজার দেশে'' ছবিতে ব্যবহৃত কিছু ব্যঙ্গলেখ উল্লেখের দাবী রাখে। ''জানার কোন শেষ নেই/ জানার চেষ্টা বৃথা তাই'' অথবা ''বিদ্যালাভে লোকসান/ নাই অর্থ, নাই মান'' পংক্তিগুলি আমাদের শাসনযন্ত্রের এই অন্ধকার দিকের প্রতি তীব্র satire। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গড়ার যে কথা নেহেরু বলেছিলেন তাকে 'সোনার পাথরবাটি' -ই মনে হয়। এ দেশের শাসনব্যবস্থা তার সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মাধ্যমে ধনী আর গরিবের ব্যবধান বাড়িয়ে চলে। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ সমৃদ্ধ হয় ব্যাপক অংশের মানুষকে রাষ্ট্রীয় মদতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষণ করে। সুতরাং সমাজের এই অবহেলিত হতদরিদ্র, অশিক্ষিত শ্রেণী থেকেউঠে আসে, লক্ষ লক্ষ শিশুশ্রমিক। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শিশুশ্রমকে অনিবার্য নিয়তি হিসেবে মেনে নিতে হয় স্বাভাবিক ভাবেই। আমাদের দেশের গড় আয় (GDP) খাতায় কলমে যতই বাড়ুক, বাস্তবিক দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক দিনে ২০ টাকার বেশী খরচ করার সামর্থ্য রাখেন না। সেইসব পরিবারে যে শিশু জন্মায় তাকে অর্থ উপার্জনের তাগিদেই রোজগারের রাস্তায় নামানো হয়। আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের শাসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হতে প্রায় ৫০ বছর লেগে গেল কারণ ১৯৯৭ সালে সমগ্র দেশব্যাপী ''সর্বশিক্ষা অভিযান'' প্রকল্প নেওয়া হয় যার মাধ্যমে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, স্কুল ছুটদের (Drop out) হার কমানোর জন্য মধ্যাহ্নকালীন খাওয়া (Midday Meal) বন্দোবস্তও করা হয়। কিন্তু এত করেও 'Drop out rate' কমানো যাচ্ছে না কারণ শিশুকে শুধু নিজের পেট ভরালেই চলবে না, তার পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে হয়।

২০০১ সালের একটি তথ্য বলছে পশ্চিমবঙ্গে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা (অসংগঠিত ক্ষেত্রে ধরে) প্রায় ৮ লাখ ৫৭ হাজার এবং এই সংখ্যা বছরে গড়ে ৪ শতাংশ করে বাড়ছে। ২০০১ সালের জনগণনা (Census) অনুযায়ী ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৩ কোটিরও বেশী এবং এর পরে আরো ৮-৯ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে বৈ কমে নি। এ রাজ্যের শিশুশ্রমিকদের মধ্যে তিন লাখেরও বেশি বিভিন্ন ক্ষতিকারক শিল্প যেমন ইটভাটা, বিড়ি, কার্পেট, পশম, ওষুধ, ব্যাটারি চার্জিং, প্লাস্টিক, দেশলাই, বারুদ ইত্যাদিতে কাজ করে যদিও কেন্দ্রীয় আইনে ১৫ ধরণের জীবিকা ও ৫৭ ধরণের উৎপাদন শিল্পে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের একটি ব্লকের বেশ কিছু গ্রামে কাঠবাদামের (শক্তখোলাযুক্ত) খোলা ছাড়ানোর কাজে নিযুক্ত বহু শিশুশ্রমিক। এ কাজে ব্যবহৃত হয় ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক। ন্যূনতম কোন সুরক্ষা ছাড়াই শিশুদের ঐ রাসায়নিক ব্যবহার করে বাদামের খোলা ছাড়াতে হয়। কয়েকমাসের ভেতর প্রায় ৮০০ শিশুকে পাওয়া যায় যাদের হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুরো খয়ে গেছে অথবা ক্ষয়িষ্ণু। একটি স্থানীয় NGO ব্যাপারটি দৃষ্টিগোচরে আনার চেষ্টা করলেও প্রশাসন নির্বিকার থাকে। কারণ ঐ শ্রমিকেরা কেউই নথিভুক্ত নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ঐ শিশুদের পরিবারের কেউ এই দুর্দশার কথা স্বীকার করতে চান নি। কারণ এর ফলে ঐ শিশুকে কাজ হারাতে হবে এবং পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরকম অদ্ভুত জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয় এই 'দুর্ভাগা দেশের' বহু শিশু। সেই ১৯৭৯ সালে ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষেই শিশুশ্রমকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৬ সালে শিশুশ্রমিক (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৯৫ সালে এই আইন বলবতের জন্য বিধি প্রণয়ন করা হয় যেখানে ১৪ বছরের নিচে কোন বিপজ্জনক কাজে শিশুশ্রমকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি/ সংস্থাকে শাস্তিদানের কথা বলা হয়। অবিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রেও কিছু আইনগত বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা বলা হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জেনে রাখা ভালো যে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে শিশুদের অধিকার নিয়ে চুক্তিপত্রে ভারত সই করে এবং ১৯৯২ সালের ১১ ডিসেম্বর এই সইয়ের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক শিশুকে বেঁচে থাকা, শিক্ষা, খেলাধূলা ও নিরাপত্তার অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল আইনের

রক্ষাকবচ এড়িয়েই ফি বছর বেড়ে চলেছে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা যা সবরকম সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

উপরিউক্ত সরকারী তথ্যের বাইরেও এক বড় অন্ধকার ব্যাপৃত করে রেখেছে এই বর্বর প্রথাকে। অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বিভিন্ন বাড়ীতে গৃহভৃত্যের কাজ করে। Maid Servent-দের অনেক ক্ষেত্রে যৌন লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় (প্রতিমাসে গড়ে একটি ঘটনা আমরা কাগজে দেখে থাকি)। বিভিন্ন খাওয়ার হোটেল বা রেস্তোরায় খাবার পরিবেশন, জায়গা পরিষ্কার, থালা বাসন ধোয়ার মত অমানবিক কাজ এদের দিয়ে করানো হয় খুব অল্প অর্থের বিনিময়ে। এছাড়াও লোকাল ট্রেনে হকার (Hawker) হিসেবে অনেক শিশুরা শ্রম দেয়। যে সময় তাদের গায়ে থাকার কথা বিদ্যালয়ের পোষাক, সে সময়ে তারা একটা ছেঁড়া, ময়লা গেঞ্জী পরে অর্ধ - আদুর গায়ে ভারী বোঝা টেনে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় ছুটে বেড়ায়। ঐ পেলব হাতে তুলে নেয় জুতোর কালি, ব্রাশ। আদমসুমারী এই হতভাগ্যদের কোন হিসেব রাখে না। অনেকক্ষেত্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য হিসেবেই ঐ শিশুরা কাজ করে। তাদের বাবা-রা হয় উপার্জনশীল নয় না হয় মৃত অথবা স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাহীন। কখনও বা পরিবারের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হতে হয় শিশুদের। তাদের রোজগারের পয়সা কেড়ে নিয়ে বাবা মদ খাচ্ছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। এবার একটু অন্য দৃষ্টিকোন। কিছুদিন ধরে বোকাবাক্সে 'Reality Show' নামে এক প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে যেখানে মূলত অংশ নেয় শিশুরাই। তথাকথিত শিক্ষিত এবং সম্পন্ন পিতা - মাতা তাঁদের প্রত্যাশার বাজি হিসেবে শিশুকেই ঐ যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার লক্ষ্যে শিশুকে তার বয়স ও ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অনেক কিছু রপ্ত করানো হয় যা তার কোমল হৃদয়ে দীর্ঘ রেখাপাত করে। নিজেদের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য ছোট ছোট এইসব শিশুদের শৈশবের স্বাধীনতা, সুকুমার আনন্দ কেড়ে নেওয়াকে আমরা কি বলব? এটাতো শিশুদের 'Exploited' হওয়ার একট দিক যাকে 'শিশুশ্রম' পুরোপুরি না বললেও শ্রমের শ্রান্তি পরাধীনতা তো কিছুটা থেকেই যায়। বাবা - মায়েরা কি একবার ভেবে দেখবেন?

বর্তমান আলোচনা এই সমস্যার প্রগাঢ়তা ও ব্যপ্তি অনুধাবনে সহায়তা করার পাশাপাশি এর পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি দেখে (বিভিন্ন আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও) এ আশঙ্কাই প্রকাশ করে যে এর সমাধান শুধুমাত্র আইন পুস্তকের পাতায় সীমিত নয়, যদিও একথা ঠিক কোন সামাজিক সমস্যার সমাধানেই আইন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় না। Labour Organisation (ILO), UNCEF, WHO, Christian Children Fund (CCF) Child in new Institute (CINI) প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রথা নিবারণের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমান্তরালভাবে সরকারী উদ্যোগ যথা আইন প্রণয়ন! সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তিদান (যদিও তা খুব কম; ১৯৯৩-৯৪ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৬,৮৬১টি অভিযোগের মধ্যে শাস্তি হয়েছে মাত্র ২৬৪ টি ক্ষেত্রে), মায় যে কারখানা বা শিল্পে শিশু কাজ করে তার মালিকের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা ইত্যাদিও শিশুশ্রমের অবলুপ্তিতে খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (NGO) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার - অভিযান সংগঠিত করে ও নিদিষ্ট কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ঐ নিপীড়িত শিশুদের সমাজের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা আন্তরিক ভাবেই করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও এইসব প্রচেষ্টাগুলিকেই যেন বিচ্ছিন্ন মনে হয় এই সমস্যার বিপুলতার কাছে। আসলে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি এবং যে আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের দৈনন্দিনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে এই প্রথার অবসান পুরোপুরি সম্ভব নয়— এ সত্যকে মেনে নিয়েই বোধ হয় আমাদের এগোনো উচিত। আমাদের সবপ্রচেষ্টাই অস্থায়ী প্রতিকার (Temporary Relief) ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুশ্রমের সম্পূর্ণ নিরসন সম্ভবত বাস্তব সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী শাসন কাঠামোয় যেখানে ব্যক্তি মালিকানা বা ধনিক শ্রেণীর অভিভাবকত্বের বদলে থাকবে সর্বহারা বা শ্রমিক (কৃষক ও শ্রমিক) শ্রেণীর আধিপত্য। তাদেরই প্রতিভূ হবে সাম্যবাদী সমাজ যেখানে উৎপাদিত ও অবস্থিত সব সম্পদে থাকবে সকলের সমানাধিকার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ কারো কুক্ষিগত হবে না। এই আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সব নাগরিকের ভাল - মন্দের দায়িত্ব - রাষ্ট্রের, সকল শিশুর সেই প্রতিপালক। এ দায়িত্ব আমাদের দেশের মত সংবিধানের মায়াজালে আবদ্ধ নয়, এ দায়িত্ব প্রত্যেককে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদানের মধ্যে (উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কিউবার কথা, রাষ্ট্রপুঞ্জের ২০০৬ সালে সমীক্ষা অনুযায়ী যে দেশে একজন মানুষও অনাহারে থাকে না যেখানে ইউরোপের বিভিন্ন ধনী দেশে এই সংখ্যা মোটেও নগন্য নয়)। কারণ অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ভুখা মানুষ জীবনধারণের জন্য আগে খোঁজে উপার্জন, পরে শিক্ষা। শিশুশ্রমিকদের প্রায় পুরোটাই সমাজের গরিব প্রান্তিক ও অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রকাঠামোয় এরকম কোন শ্রেণীর অস্তিত্বই থাকে না। উল্টোদিক থেকে দেখলে, আমদের দেশের আধাসামন্ততান্ত্রিক ধন (ভোগ) বাদী কাঠামোর পিলসুজ এই শ্রেণী। তাই এদের অস্তিত্ব কখনই বিলুপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। এদের শোষণ, বঞ্চনার মাধ্যমেই ধনীর মুনাফা বা ঐশ্বর্য্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিশুশ্রমের অবলুপ্তি এক অলীক কল্পনা— একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

নিবন্ধ লেখকের এক মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই আলোচনা শেষ করা যাক। ট্রেনে করে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে একদিন সামনে আসে এক জীর্ণ বালক, ততোধিক জীর্ণ পোশাক পরিহিত, যে খালি পায়ে একটি প্লাস্টিকের কৌটোয় করে সামান্য খাবার ফেরি করছে। খাবারের নাম জিজ্ঞেস করায় বলল 'মরণ (মদন?) কটকটি'! এই দার্শনিক উত্তরজাত বিভ্রান্তি সামলানোর আগেই কিছুটা তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ ভরে আবার বলল 'খেলেই মরবে'। তারপর ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছুঁতেই যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে নেমে গেল ঠিক যেমনভাবে উঠেছিল। বিষণ্ণ, বিমর্ষ মনে অন্দরে তখন গুমরে বেড়াচ্ছে একটাই শব্দ – 'মরণ'! ঐ ছেলেটার মুখ যেন ভিড়ের মধ্যেও তাড়া করছে আমাকে— আমি পালাচ্ছি। আসলে আমরা সবাই পালাচ্ছি লজ্জায়, ব্যর্থতায়, ভয়ে। নবজাতকের কাছে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার (কবির চিন্তায়) সফলভাবে নিতে পারিনি আমরা কেউই। আমাদের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা এনে দিতে পারে নি সেই পৃথিবী যেখানে ওদের সাতরঙা অনুভূতিরাজি ডানা মেলবে নিজস্ব উচ্ছলতার আনন্দে, ভালবাসার অভিমানে। ওদের বুকে ঘুমিয়ে রয়েছে একটা অনন্ত গোলার্ধ জেগে ওঠার অপেক্ষায় যেখানে—

"Myriad movements and sounds of myriad kinds In a flimsy universe, encircled by my mind. Inside that world, my thoughts would lightly glide."